যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৪৮ পিএম

উপসম্পাদকীয়

শিক্ষায় যুগোপযোগী সংস্কারের রূপরেখা

ড. ইমরান হোসেন খান
প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

‘যে জাতি শিক্ষায় যত অগ্রসর, সে জাতি তত উন্নত’-এটি কোনো আবেগী স্লোগান নয়, বরং বিশ্ব ইতিহাসের এক অনিবার্য সত্য। যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলো শিক্ষার গুণগত মান ও কর্মমুখী দক্ষতার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশেও গত কয়েক দশকে উচ্চশিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে ১৭০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু সংখ্যার এ বৃদ্ধি মানোন্নয়নের সমান্তরাল অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারেনি। এখন প্রয়োজন শিক্ষাকে একটি যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে দক্ষতাভিত্তিক, কর্মমুখী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কাঠামোয় রূপান্তর করা। নতুন সরকারের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার ও চ্যালেঞ্জ।

বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ : বর্তমানে দেশে বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ, যার মধ্যে প্রায় ৯ লাখই শিক্ষিত, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও একটি বড় অংশ কর্মবাজারে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের করপোরেট ও টেকনিক্যাল সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অংশে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের পেশাজীবীরা কাজ করছেন, এমনকি অনেক বড় প্রকল্প বাস্তবায়নেও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এ বৈপরীত্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মবাজারের মধ্যকার অসামঞ্জস্যকেই স্পষ্ট করে।

এখানে মূল প্রশ্নটি দক্ষতার। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন ধরে মুখস্থনির্ভর, পরীক্ষাকেন্দ্রিক ও পুঁথিগত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে। ফলে তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলেও বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা, যেমন সমস্যা সমাধান ক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা, উপস্থাপন ক্ষমতা, দলগত কাজ, প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা, ইংরেজিতে সাবলীলতা এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যায়। করপোরেট সেক্টরে নিয়োগের সময় ইন্টারভিউ বোর্ড সাধারণত এসব ব্যবহারিক ও পেশাগত স্কিলকেই অগ্রাধিকার দেয়। ফলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মূল সমস্যা শিক্ষণব্যবস্থা ও কারিকুলামে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ঐতিহ্যনির্ভর লেকচারভিত্তিক শিক্ষাদানই মুখ্য, যেখানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ (স্টুডেন্ট এনগেজমেন্ট/অ্যাকটিভ লার্নিং) নিশ্চিত করা হয় না। বাস্তবমুখী শিক্ষা কার্যক্রমের অভাবও প্রকট; শিক্ষকরা ক্লাসে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান দিচ্ছেন, তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের প্রয়োগকে

সংযুক্ত করছেন না। ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল মুখস্থনির্ভর জ্ঞান অর্জন করছে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা ও সমস্যার সমাধানমূলক চিন্তাভাবনা তৈরি হচ্ছে না। এখানেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা।

আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি : নতুন সরকারের কাছে আমাদের প্রথম প্রত্যাশা, শিক্ষাকে দক্ষতাভিত্তিক ও কর্মমুখী করা। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা কেবল বইনির্ভর হতে পারে না; এটি হতে হবে অংশগ্রহণমূলক, প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনমুখী। এখানে শিক্ষার্থীরা কেবল শুনবে না, বরং লার্নিং প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে। শিক্ষণ-শিখন (টিচিং অ্যান্ড লার্নিং) প্রক্রিয়া হবে আনন্দময় ও ফলপ্রসূ। প্রথমত, ফ্লিপড ক্লাসরুম, প্রবলেম-বেইজড লার্নিং, প্রজেক্টভিত্তিক শিক্ষা, সিমুলেশন-বেইসড লার্নিং এবং কেস স্টাডি পদ্ধতির মতো আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি জাতীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই-চালিত) শিক্ষণ টুলস প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও শক্তি অনুযায়ী শেখার কনটেন্ট সাজিয়ে দিতে পারে, যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, ভার্চুয়াল ল্যাব ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জটিল বিষয়গুলো হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে পারে। চতুর্থত, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পর্যায়ে কারিকুলাম সেমিস্টারভিত্তিক করা জরুরি। এতে বছরে একবারের বড় পরীক্ষার পরিবর্তে মিডটার্ম, কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশনসহ বিভিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। পঞ্চমত, গ্যামিফিকেশন, পিয়ার-লার্নিং এবং মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়ালসের মতো আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয়, অংশগ্রহণমূলক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। পাঠ্যবিষয়কে গেমভিত্তিক চ্যালেঞ্জে রূপান্তর করা হলে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক ও আনন্দময় পরিবেশে শিখতে আগ্রহী হয়। ষষ্ঠত, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যেন তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা অনুযায়ী পাঠদান করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক শিক্ষণ অবকাঠামো অপরিহার্য। ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ থাকা আবশ্যক। সর্বোপরি, শ্রেণিকক্ষে ইনক্লুসিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা প্রয়োজন, যা

ফলপ্রসূ শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনো আমাদের অনেক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে ভয় পায়, শিক্ষককে চ্যালেঞ্জ করতে সংকোচ বোধ করে। অথচ শিক্ষা হওয়া উচিত এমন এক পরিবেশ, যেখানে মুক্তভাবে প্রশ্ন, আলোচনা, বিতর্ক ও সমালোচনার সুযোগ থাকবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : উপরিউক্ত আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিগুলো জাতীয় শিক্ষা নীতিমালার আলোকে কার্যকর করতে হলে শিক্ষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অপরিহার্য। এজন্য প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সব শিক্ষকের জন্য ধারাবাহিক, মানসম্মত ও প্রয়োগমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি। এককালীন ওয়ার্কশপ নয়, নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করে তোলা সম্ভব।

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া : ভালো মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে যোগ্য শিক্ষক অপরিহার্য। বর্তমানে দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত গড়ে ১:৩০, যা ইউনেস্কোর মানদণ্ড ১:২০ থেকে অনেক বেশি, কিছু স্থানে ১:৬০ পর্যন্ত। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ অবশ্যই জরুরি, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুগোপযোগী করতে হলে একটি কার্যকর নির্বাচন কাঠামো জরুরি।

এবার নজর দেওয়া যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, উৎকর্ষ গবেষণা, প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থান অনেকাংশেই নির্ভর করে উপাচার্যের যোগ্যতা ও নেতৃত্বের ওপর। দেশে উপাচার্য নিয়োগে দলীয় বিবেচনার অভিযোগ প্রায়ই আলোচনায় আসে, যা মানসম্মত শিক্ষার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উপাচার্য নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও কার্যকারিতাভিত্তিক। সেখানে একাডেমিক কৃতিত্বের পাশাপাশি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বগুণ এবং দীর্ঘমেয়াদি ভিশনকে প্রধান হিসাবে ধরা হয়। বাংলাদেশেও স্বচ্ছ সার্চ কমিটি, খোলা প্রার্থী তালিকা এবং নিরপেক্ষ মূল্যায়নের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে হবে।

বেতন ও শিক্ষকের মর্যাদা : শিক্ষক যেন উচ্চমানের পাঠদান ও গবেষণা নিশ্চিত করতে পারেন, সেজন্য তাদের যথাযোগ্য সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক মর্যাদা থাকা অপরিহার্য। বাংলাদেশে শিক্ষক সমাজ আর্থিকভাবে অনেকটা উপেক্ষিত। আন্তর্জাতিক তুলনায় আমাদের শিক্ষকদের আয় কমপক্ষে ১০-২০ গুণ কম। উন্নত দেশগুলোতে বেতনের সঙ্গে গবেষণা অনুদান, স্টার্ট-আপ গ্রান্ট এবং শিল্প খাতের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ থাকে, যা শিক্ষকদের উচ্চমানের গবেষণার দিকে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশে অনুদান সীমিত, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ কঠিন এবং আর্থিক প্রণোদনা কম। এর ফলে মেধাবী শিক্ষকরা হতাশ হন এবং অনেকে বিদেশে কাজের পথ বেছে নেন। তাই নতুন সরকারের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, দেশের শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা, প্রণোদনা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিন, যাতে তারা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গঠন ও শিক্ষায় আরও নিবেদিত হয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারেন।

উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ কেবল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধিতে নয়, বরং মানোন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও দক্ষতাভিত্তিক রূপান্তরের মাঝে নিহিত। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ ও দক্ষতাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। নতুন সরকারের প্রতি প্রত্যাশা, কার্যকর নীতি, যথাযথ অর্থায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তিতে রূপান্তর করা হবে। শিক্ষায় সাহসী ও বাস্তবমুখী সংস্কার ছাড়া উন্নত বাংলাদেশ গঠন কেবল আকাঙ্ক্ষা হয়েই থেকে যাবে।

ড. ইমরান হোসেন খান : সহযোগী অধ্যাপক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্যবিদ্যালয়, গাজীপুর

imran.duet56@gmail.com